অথৈ জল : ভিন্ন পাঠ

তপোধীর ভট্টাচার্য

এক

'রসসাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে প্রত্যেকের ভেতরকার স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তি বিধান করা।'

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *স্মৃতির রেখা*-য় পরিশিষ্ট অংশে সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে এই যে মন্তব্য করেছিলেন তা বহুবার চর্চিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের নান্দনিক বিশ্ববীক্ষা ও সামাজিক ভাবাদর্শ এবং একইসঙ্গে তার শক্তি ও দুর্বলতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এখানে। বয়ানের শুরুতেই নিশ্চয় তর্কে জড়িয়ে পড়তে চাই না। কিন্তু কেন লিখব আদৌ, কাদের জন্যে লিখব — এই মৌলিক প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর সব সাহিত্যিকের থাকে। বিভূতিভূষণেরও ছিল। যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন তা-ই অকপটে ব্যক্ত করতেন; অনিবার্য প্রতিপ্রশ্নের মোকাবিলা করার কথা ভাবেননি কখনো। কেননা প্রত্যেকের ভেতরে 'স্বপ্নালু' সত্তা থাকলেও শুধুমাত্র তার তৃপ্তি বিধান সাহিত্যিকের 'প্রধানতম কাজ' হতে পারে না। জীবন মানে শুধু বাস্তবের গ্রন্থিলতা যেমন নয়, তেমনই নিছক স্বপ্নদর্শিতাও নয়। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে না পারলে শিল্প সৃষ্টি হয় না। সম্ভবত এখানে বিশ-শতকের অন্যতম পুরোধা সাহিত্যস্রষ্টা ও তাত্ত্বিক সমালোচক জাঁ পল সার্ত্র-র *What is Literature* বইয়ের এই চিন্তাপ্রসূ মন্তব্যটি স্মরণ করতে পারি :

> The writer knows that he speaks for freedoms which are swallowed up, masked and unavailable; and his own freedom is not so pure; he has to clean it. It is dangerously easy to speak too reality about eternal values; eternal values are very, very fleshless. Even freedom, if one considers it sub specie aeternitatis, seems to be a withered branch; for, like the sea, there is no end to it. It is nothing else but the movement by which one perpetually uproots and liberates oneself. There is no given freedom.
>
> (1981 : 49)

যে-স্বাধীনতা চেতনার, প্রকৃত আত্মিক মুক্তি ছাড়া তা অর্জন করা অসম্ভব। লেখক সেই পরিসরই নির্মাণ করতে চান যা তাঁর সৃষ্টিকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। কোনোরকম আরোপিত রুদ্ধতা ও অচলায়তনের প্রতি আনুগত্য নিয়ে শুদ্ধতায় ও স্বাধীনতায় পৌঁছানো যায় না। চিরন্তন মূল্যবোধের নামে শপথ নিয়েও কি যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের শিল্পিত নির্মাণে সময়ের বিনাশক রূপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব? স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু যে-স্বপ্ন বাস্তবকে আড়াল করে, যুক্তিকে নিষ্প্রভ করে দেয় তা কি মানুষের অগ্রগতি ও স্বাধীন সঞ্চরণের সহায়ক হতে পারে? এই জিজ্ঞাসার সমাধান কি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানবিশ্বে পাই? বিভূতিভূষণের কাছে বাস্তব ব্যঞ্জনাময় হওয়ার মধ্য দিয়েই রসোত্তীর্ণ হয়। বাস্তবতার সীমা কতদূর, তা তাঁকে ভাবিয়েছে।

প্রাগুক্ত *স্মৃতির রেখা*-বইতে তিনি লিখেছিলেন :

> কথাশিল্পীকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্টগোল যেখানে বেশী, যে প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে সে সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে। ... কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? ... সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষ সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য। সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি দিয়ে।

এই মানুষের ছবি আঁকার কত যে ধরন রয়েছে, তা দেখেছি বিভূতিভূষণের আখ্যানে, উপন্যাসে ও ছোটোগল্পে। শুধু তো *পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, অনুবর্তন* নয়, 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'কিন্নরদল', 'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর' এবং 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল'-এর মতো বয়ানেও দেখতে পাই 'স্বাধীনতা' ও 'সংযম'-এর সার্থক দ্বিবাচনিকতার দৃষ্টান্ত। তবে যেসব উপন্যাস সম্পর্কে সাধারণ পড়ুয়া ও সমালোচক বেশি আগ্রহী, তাদের তুলনায় স্বল্পপঠিত বয়ান *দুই বাড়ী, বিপিনের সংসার, দম্পতি* বা *অথৈ জল* সম্পর্কে আজকের পাঠক কীরকম অবস্থান নেবেন? এই প্রতিবেদনে বিভূতিভূষণের দ্বাদশ উপন্যাস *অথৈ জল* সম্পর্কে পড়ুয়া হিসেবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে চাইছি।

অথৈ জল ধারাবাহিক রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত *প্রভাতী* নামক মাসিক সাহিত্যপত্রে যা পাটনা থেকে বেরোত। আর, গ্রন্থাকারে তা কলকাতার ডি.এম. লাইব্রেরি প্রকাশ করেছিল ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের কার্তিকে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে। *কেদার রাজা*-র মতো এই উপন্যাসেও বিভূতিভূষণ পতিতালয়ের ছবি উপস্থাপিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের বয়ানে এ সম্পর্কে যে-ভাববাদী বলয় তৈরি হতে দেখি, বিভূতিভূষণের উপন্যাস নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। একটি কথা লেখা প্রয়োজন। *অথৈ জল*-এর দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর পরিকল্পনায় ছিল কিন্তু মৃত্যু বাধ সাধায় তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বইটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যথাপ্রাপ্ত বয়ানের শেষাংশ পড়লে এই অপূর্ণতা প্রকট হয়ে ওঠে যা নান্দনিক সমস্যাও তৈরি করে :

> সনাতনদা এগিয়ে এল আমার দিকে। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে এল। যেন বিশ্বাস করতে পারচে না যে আমি।
>
> বলি — কি সনাতনদা যে!
>
> ও বিস্ময়ের সুরে বললে — তুমি!
>
> — হ্যাঁ। ভাল আছো?
>
> সনাতনদা একবার আমার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিলে। কি দেখলে জানি নে, আমার হাসি পেল। — কি দেখচ সনাতনদা? ... ও যেন অবাক-মত হয়ে গিয়েচে।
>
> সনাতনদা এসে আমার হাত ধরলে। আর একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। বললে — এসো, চলো কোথাও গিয়ে বসি, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। চলো একটু ফাঁকা জায়গায়।

বললাম — সুরবালা ভাল আছে? ছেলেপিলেরা?

— চলো। বলচি সব কথা। একটা চায়ের দোকানে নিরিবিলি বসা যাক্ —

— চায়ের দোকানে নয়, নেবুতলার ছোট্ট পার্কটায় চলো —

এভাবে যে কোনো উপন্যাসের প্রতিবেদন শেষ হতে পারে না, এ বিষয়ে বাক্‌বিস্তারের প্রয়োজনই নেই কোনো। এমনকী কোনো বিশেষ খণ্ডের সমাপ্তিও এরকম হয় না। মনে হয় যেন লিখতে লিখতে হঠাৎ-ই কলম থামিয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা তো কথকতার মোহনার পরিচয় পেলাম না। ফলে যে-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে উৎস বা অববাহিকার সঙ্গে মোহনার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক বা তার অভাব পর্যালোচনা করতে পারতাম, তার সুযোগই থাকল না। *পথের পাঁচালী* বা *আরণ্যক* বা *ইছামতী* যে-অর্থে আখ্যান, *অথৈ জল* রয়েছে তার বিপরীত মেরুতে। তবু উপন্যাসের শিল্প-পদবি অর্জন করতে হলে বয়ানকে কোনো-না-কোনোভাবে কাহিনির উদ্বৃত্ত মূল্যের ধারক হতে হবে। প্রশ্ন হল, এই প্রতিবেদন কি সেই দাবি করতে পারে? সার্থক উপন্যাসের জন্যে যে-মাপকাঠি ব্যবহার করি, তা *অথৈ জল* সম্পর্কে আদৌ প্রযোজ্য কি! এ প্রসঙ্গে যে-কথাটি না লিখলেই নয় তা হল, বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সমালোচনা পদ্ধতি খুবই একদেশদর্শী এবং পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার অনুগামী। একুশ শতকের চোদ্দো বছর পেরিয়ে এসে আমরা যখন অহরহ রূপান্তর প্রবণ, চূড়ান্ত অস্থির ও অনিশ্চিত সমাজ-পরিসরের অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছি, আমাদের দেখার চোখ ও অনুভবের সঙ্গে সাহিত্য পাঠের প্রকরণও কি বদলে যাচ্ছে না? চিরাচরিত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও শুধুমাত্র চিরসময়ের বার্তাই কি পেতে চাই আখ্যানে? খণ্ডকাল যাবতীয় সীমাবদ্ধতা এবং দহনের বাস্তব নিয়ে যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, কোনো লেখক কি তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন! এইসব প্রশ্ন তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে প্রচলিত সমালোচনা-পদ্ধতি যখন অনুসরণ করতে চাই।

দুই

এই কথাগুলি অনিবার্য হয়ে উঠল বিভূতি রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে সুমথনাথ ঘোষ লিখিত ভূমিকাটি পড়ে। যেহেতু সাম্প্রতিক পাঠতত্ত্ব অনুযায়ী লেখকের পাঠকৃতি সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনগুলিকেও তার সম্প্রসারিত বয়ান হিসাবে গণ্য করা হয়, তাদের মুখোমুখি হয়েই কেবল নিজস্ব তাৎপর্যে পৌঁছাতে পারি। মহৎ লেখক তাঁকেই বলি যিনি শুধু সার্থক রচনার মধ্যে আপন নান্দনিক ও দার্শনিক দ্যুতি বিকিরণ করেন না। বরং *অথৈ জল*-এর মতো তুলনামূলকভাবে অসার্থক রচনার মধ্যেও মহৎ স্রষ্টার শিল্পী সত্তা তাঁর অগোচরেই আত্মপ্রকাশ করবে। বা ঈঙ্গিত রূপকের আশ্রয় নিয়ে এও লেখা যায়, সূর্য কেবল পর্বত-শিখরে বা বনস্পতির উচ্চশাখা-প্রশাখায় আলো ছড়ায় না, উপত্যকায় এবং জলাভূমিতেও ওই আলোর রেশ ছড়িয়ে পড়ে। তবে লেখকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল তাঁর বিশ্ববীক্ষা বা দার্শনিক অবস্থান কেননা সৃষ্টির নন্দন তারই অনুগামী হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণের সামগ্রিক সত্তা যদি বিবেচনার মধ্যে থাকে, বুঝতে পারব, *অথৈ জল* উপন্যাসে তিনি কতখানি নিজের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন! *পথের পাঁচালী*, *আরণ্যক*, *ইছামতী*,

দৃষ্টিপ্রদীপ-এর বয়ানে যে-ব্যঞ্জনাময় বাস্তব উপস্থিত, তার চেয়ে স্বতন্ত্র — হয়তো বা ভিন্ন অবতলের — বাস্তব কীভাবে ধরা দেয় বিভূতিভূষণের কাছে এবং তাতে খণ্ডসময় ও খণ্ডপরিসরের প্রতি তাঁর সুবিদিত দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি কার্যকরী, তা ভেবে দেখতেই হয়। *দাম্পত্য* নামক উপন্যাস সহ *অথৈ জল* এর প্রতিবেদনে যে অসফল দাম্পত্যের ছবি পাই, নিজে সুখী ও পরিতৃপ্ত স্বামী হয়েও কেন তিনি ব্যর্থতা ও অপূর্ণতার ছবি আঁকলেন — এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। সর্বদাই তিনি *পথের পাঁচালী* বা *ইছামতী*-র অনুলিপি তৈরি করতে থাকবেন : কোনো পাঠক যদি এমন প্রত্যাশা করেন, তা নিতান্ত ভুল। কিংবা সব বইতেই কোনো-না-কোনোভাবে *আরণ্যক*-এর অনুসৃতি থাকবে, এই ধারণাও বিভূতিভূষণের প্রতি অবিচার।

এ প্রসঙ্গে আরও একবার ফিরে যাই জাঁ পল সার্ত্রের কাছে। প্রাগুক্ত *What is Literature* বইয়ের 'Writing for one's age' শীর্ষক পরিশিষ্টে তিনি এই দ্যোতনাগর্ভ মন্তব্য করেছেন :

> It is of the whole man and by the whole man and that art is a mediation on life and not on death.
>
> (1981 : 232)

ঠিক। শিল্পসৃষ্টি সমগ্র মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের দ্বারা ঘটে এবং মৃত্যু বা ক্ষয় নয়, জীবনের ধ্যানই তার উপজীব্য। কথাকার যদি মানবিক সমগ্রতার বদলে তার কোনো একটি ভগ্নাংশে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, জীবনের সমগ্র রূপ চলে যাবে আড়ালে; বড়ো হয়ে উঠবে খণ্ডরূপ যা হবে সত্যের আচ্ছাদক। যেমন *অথৈ জল* উপন্যাসে ব্যর্থ দাম্পত্যের প্রেক্ষিতে প্রৌঢ় শশাঙ্ক ও কিশোরী পান্নার অসম্পূর্ণ প্রেমকথা। সার্ত্র আরও কিছু আগ্রহোদ্দীপক কথা লিখেছেন :

> The most beautiful book in the world will not save a child from pain; one does not redeem evil, one fights it; the most beautiful book in the world redeems itself; it also redeems the artist. But not the man. Any more than the man redeems the artist. We want the man and the artist to work their salvation together, we want the work to be at the same time an act; we want it to be explicitly conceived as a weapon in the struggle that men wage against evil.
>
> (তদেব : ২৩৩)

রক্ষণশীল সমালোচকেরা বিভূতিভূষণের সমকালে ও উত্তরকালে অনান্দনিক অচলায়তনের পতাকাবাহী রূপে যা-ই ভেবে থাকুন, শশাঙ্ক-পান্নার সম্পর্ক কি কথাকারের কাছে 'evil' হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল? পাঠকৃতি এ বিষয়ে কোনো সূত্র জোগান দেয় কি? হরিহর ও সর্বজয়ার দাম্পত্য থেকে যিনি ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে তিলু-বিলু-নীলুর আদর্শায়িত দাম্পত্যে প্রশ্নহীনভাবে পৌঁছাতে পারেন, তাঁর কাছে চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ভাবাদর্শ কোনো জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় না। এমনকী, আখ্যানে পুনর্বিবেচনার প্রস্তাবনাও দেখি না। জীবনের শেষ পর্যায়ে *অথৈ জল* বা *দাম্পত্য* লেখার সময়ও তাঁর মৌলিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও 'অমঙ্গল' বা 'evil'এর দার্শনিক প্রতীতি উপন্যাসে পরীক্ষিত হয়নি। সুতরাং সার্ত্র-র মন্তব্য

অনুযায়ী 'one does not redeem evil, one fights it' কথাটিও বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। দাম্পত্য সম্পর্কের শুদ্ধতা থেকে বিচ্যুতি ভারতীয় সমাজ-সংবিদে কাম্য নয়। তবে এতে পুরুষের চেয়ে নারীর দায়িত্ব অনেক বেশি কেননা 'গৃহিণী সচিবঃ সখী' হিসেবে সে গৃহদীপ্তি। তবে গার্হস্থ্যে বহুবছর পেরিয়ে যাওয়ার পর নর্মসহচরী বা 'ললিতে কলাবিধৌ' ভূমিকা যখন স্বভাবত ম্লান হয়ে পড়ে, স্নেহ-বন্ধুত্ব-সহমর্মিতা দিয়ে পুরুষ কি তা পূরণের চেষ্টা করে? এ বিষয়ে ভারতীয় পুরুষতন্ত্র কিন্তু নারীর জগৎ ও চাহিদা সম্পর্কে সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয় না। মধুলোভী ভ্রমরের মতো নতুন ফুলের সন্ধান করা কি কোনো পুরুষের রোমান্টিক প্রেমতৃষ্ণা হিসেবে বিবেচিত হবে? নাকি লাম্পট্যের পক্ষে যুক্তিশৃঙ্খলা তৈরি হবে? কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে বহু অন্তঃপুরিকার সঙ্গধন্য রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার প্রতি আসক্ত হন, তা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রেমের দৃষ্টান্ত হয়েই থাকে। নায়কের মুখে যখন শুনি 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈঃ উদ্যানলতা বনলতাভিঃ', এ আসলে রাজকীয় ভোগের গ্রামীণ বিকল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা উদ্যানলতার তুলনায় বনলতার সৌন্দর্য ভোগী পুরুষের কাছে স্বাদ বদলের অনুষঙ্গ মাত্র। ফলে পরে যখন কোনো এক নেপথ্যবাসিনী অন্তঃপুরিকার উচ্চারণে ঈষৎ ভর্ৎসনা (অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং) দ্যোতিত হয়, রাজা তা পরিহাসে উড়িয়ে দিয়েও পিতৃতন্ত্রের নিয়ামক সত্যটি বলে ফেলেন : 'সকৃৎকৃতঃ প্রণয়োয়ং জনঃ।' (মাত্র একবার তাকে ভালোবেসে ভুলে গেছি)।

তিন

এই পিতৃতন্ত্রই অপ্রতিহত প্রতাপে বিভূতিভূষণের বিশ্ববীক্ষারও নিয়ামক। *অথৈ জল*-এর নায়ক ডাক্তার শশাঙ্ক কালিদাসের দুষ্যন্তেরই উত্তরসূরি। গুপ্তসাম্রাজ্যের কালে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের কল্পলোকে সাহিত্য সৃষ্টিমুখর, আদর্শায়িত নারীপ্রতিমার নির্মাণে বহুবিবাহ প্রথা কোনো বাধা তৈরি করেনি। কিন্তু উনিশ শতকে উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যম যখন ক্রমশ বিকশিত হল, নারী-পুরুষের সম্পর্ক-বিন্যাসে পিতৃতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ তখনও বজায় রইল। বিশ শতকে বাস্তব দ্রুত পালটে গেল যদিও, চল্লিশের দশকের শেষেও মূল ভাবকল্প রয়ে গেল অপরিবর্তিত। *অথৈ জল* তারই নির্ভুল সাহিত্যিক প্রমাণ। শশাঙ্ক পুরোপুরি দুষ্যন্ত নয়, পান্নাও নয় শকুন্তলা; তবু কোথাও না কোথাও এই প্রতিতুলনার আভাস তৈরি হয়ই। পাশাপাশি বিনা দোষে পরিত্যক্তা সুরবালা কি নিষ্ঠুর সম্ভোগ-পরায়ণ পিতৃতন্ত্রের অসহায় শিকার নয়? কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ-পদ্ধতি এমনই যে *মৃচ্ছকটিক* নাটকে আমরা বসন্তসেনাকে মুগ্ধচোখে দেখি; চারুদত্তের প্রেম আমাদের বিহ্বল করে কিন্তু তার সন্তানের জননী ধুতা পাঠকৃতিতে নিতান্ত উপেক্ষিতাই থাকে। পুরুষতন্ত্র এমনই দুর্নিবার যে কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে দুজন রাজমহিষীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ যায়ই না। প্রেমিক নায়কের কার্যকলাপে আমোদ পাই কিন্তু একবারও মনে প্রশ্ন জাগে না, নতুন নারীর প্রতি ভোগী পুরুষের আসক্তি আদৌ 'প্রেম' হিসেবে বিবেচিত হবে কেন? দেখা যাচ্ছে, হাজার বছর ধরে 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'। প্রশ্নহীন ভাবে বিভূতিভূষণও সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ ও সমাজপতি প্রায়-প্রৌঢ় শশাঙ্কের হঠাৎই পান্না

নামে কিশোরী খেমটাউলীর নাচ দেখে এমন মোহিত হয়ে যাওয়া চিত্রিত করলেন কেন? তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে রূপমুগ্ধ পুরুষের পিতৃতান্ত্রিক আকল্প এমন ভাব-পিঞ্জর তৈরি করেছে যে একে এড়িয়ে যাওয়া বিভূতিভূষণের মতো 'ব্যঞ্জনাময় বাস্তব' সন্ধানী কথাকারের পক্ষেও অসম্ভব হল? তাই *বিষবৃক্ষ*-এর নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র, *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর গোবিন্দলাল কিংবা *চোখের বালি*-র মহেন্দ্র যে দীর্ঘায়ত ছায়া বাংলা উপন্যাসে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেই গ্রহণের ছায়া থেকে বিভূতিভূষণও বেরোতে পারেননি। আবার এটাও ঠিক যে পান্না হীরা নয়, কুন্দনন্দিনী তো নয়ই; তেমনই রোহিনী বা বিনোদিনী তার পূর্বসূরি নয়। ব্যক্তিত্বের নিরিখে সে পুরোপুরি আলাদা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* উপন্যাসের বসনও নয় পান্না। আপন অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে কি সৃষ্টিকুশলতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ!

এইসব জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য উদ্ধার খোঁজার জন্যে *অথৈ জল*-এর বয়ানে যেতে হয় আমাদের। সমালোচকদের কথায় খুব বেশি ভরসা না করাই ভালো। যেমন সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় *আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার, দুই বাড়ী, অনুবর্তন, কেদার রাজা, অশনি-সংকেত*-এর সঙ্গে *দম্পতি* ও *অথৈ জল*-কে নির্বিচারে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে লিখেছেন (১৯৮১ : ১৯৫) : এইসবই 'সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের মর্তকাহিনী।'

সুনীলকুমার অন্য যেসব মন্তব্য করেছেন *অথৈ জল* সম্পর্কে, এতে এই সত্যই পরিস্ফুট হয়েছে যে বিদ্যায়তনিক সাহিত্য-সমালোচনায় পূর্বধার্য সিদ্ধান্তই পদে পদে বিশ্লেষণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। একদেশদর্শী পিতৃতন্ত্র দ্বারা প্রান্তিকায়িত নারী সুরবালা যেমন ধুতা বা পদ্মাবতীর মতো প্রাপ্য মর্যাদা ও পরিসর পায় না; তেমনি পিতৃতন্ত্রের প্রতিভূ নায়কের বিভিন্ন কার্যকলাপের কোনো যুক্তিনিষ্ঠ উন্মোচনও পাই না। যেন সমালোচক খুব সাবধানে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পিঞ্জরটিকে এড়িয়ে গেছেন এবং বিভূতিভূষণের বহু-আলোচিত লেখক-সত্তার আঙরাখা দিয়ে উপন্যাসের যথাপ্রাপ্ত প্রতিবেদনকে আবৃত করে নিয়েছেন। ফলে লেখকের মতাদর্শ নান্দনিক প্রক্রিয়ায় কতখানি হস্তক্ষেপ করেছে, এই জরুরি আলোচনাটি পুরোপুরি উহ্য রয়ে গেছে। কী ঘটেছে, সেই বিবরণ দিতেই সুনীলকুমার বেশি উৎসুক; কেন ঘটেছে সে-সম্পর্কে কোনো অভিনিবেশই তিনি দেননি। তাই তিনি লিখেছেন :

> বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের আরেক কাহিনি অথৈ জল। গ্রামের নামজাদা চিকিৎসক, পল্লিমঙ্গল সমিতির সভাপতি সম্ভ্রান্ত ও নীতিবাদী নায়কের বিবাহিত জীবনে মুজরোজীবিনী এক নারীর অনুরাগ চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। অল্পবয়সে নায়কের সঙ্গে সুরবালার বিবাহ হয়। বিবাহের বাধ্যবাধকতায় এবং একত্রবাসের অভ্যাসে নায়কের মনে একধরনের সাংসারিক ভালবাসা বা মায়ার সৃষ্টি হয়েছিল সুরবালাকে কেন্দ্র করে।
>
> (পৃষ্ঠা ২৩৯)

বিশ্লেষণহীন এই বয়ান থেকে নায়ক সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা করা গেল কি? এর চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। একটু আগে ভারতীয় পরম্পরায় দাম্পত্যজীবনের আদর্শ সম্পর্কে যা লিখেছি, সেই নিরিখেও শশাঙ্ক-সুরবালার যুগ্ম-জীবনের নির্যাস স্পষ্ট হল না।

দাম্পত্য জীবন মানে কি শুধুই 'বিবাহের বাধ্যবাধকতা ও একত্র বাসের অভ্যাস'? ভারতীয় সাহিত্যে তো অজ-ইন্দুমতী, দিলীপ-সুদক্ষিণার দৃষ্টান্তও রয়েছে যা নিঃসন্দেহে নিছক 'এক ধরনের সাংসারিক ভালবাসা বা মায়া'-র চেয়ে অনেক বেশি কিছুর দ্যোতনা, দাম্পত্য সম্পর্কে বয়ে আনে। বিভূতিভূষণ *অথৈ জল*-এ যে 'অবৈধ প্রেম'-এর কাহিনি লিখেছেন, তা অসম্পূর্ণ হওয়াতে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। লেখক শেষ পর্যন্ত কোন্ পরাপাঠের প্রতিষ্ঠা করতেন, এ নিয়ে কল্পনা নিরর্থক। বরং আমরা লক্ষ করতে পারি, উত্তমপুরুষ কথকের জবানিতে উপস্থাপিত এই কাহিনিতে জীবনের সম্পর্কগত টানাপোড়েন কীভাবে কতখানি ব্যক্ত হয়েছে। বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসতাত্ত্বিক মিখায়েল বাখতিন জানিয়েছেন, 'There cannot be a figure without a ground'। তাই যে-সামাজিক জমিতে শশাঙ্ক পরিকল্পিত হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণ কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সামাজিক পশ্চাৎভূমিকে নানাভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সেইসব লক্ষ না করে শুধুমাত্র কুশীলব ও তাদের ঘিরে ঘটে-যাওয়া ঘটনা লক্ষ করলে ঔপন্যাসিকতার ভিত্তি অস্পষ্ট রয়ে যাবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা দরকার। বাখতিন বুঝিয়েছেন, এ জীবনে প্রতিটি সত্তাই পরস্পরের সহযোগী সত্তা এবং উপন্যাসের আধেয় ও আধারে, বিভিন্ন কুশীলবদের আন্তঃসম্পর্কে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষিতে যদি দ্বিবাচনিকতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই উপন্যাস ব্যর্থ। সেইজন্যে পাঠককেও ভেবে দেখতে হয়, *অথৈ জল*-এ দ্বিবাচনিকতা কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র শশাঙ্ক-সুরবালা-পান্নাকে কেন্দ্র করে কী ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং নায়কের জীবনে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুধুমাত্র তার বিবরণ দিলে বিভূতিভূষণের শিল্পসৃষ্টি স্পষ্ট হবে না। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের পক্ষপাতী বিভূতিভূষণ কী দেখাতে চাইছিলেন? আদর্শ থেকে স্খলনের অনিবার্য পরিণাম? পাপ-পুণ্য সম্পর্কে হিন্দু-সমাজে বহু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি কি তিনি অনুসরণ করেছেন?

চার

বিভূতিভূষণ যে গ্রামীণ পরিবেশকে অজস্র অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ দিয়ে স্পষ্ট করেছেন, শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ* বা *বামুনের মেয়ে* উপন্যাসে চিত্রিত গ্রাম থেকে তা কি চরিত্রগতভাবে কিছুমাত্র আলাদা? প্রতিবেদনের সূত্রধার শশাঙ্ক নিজ গ্রামে ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে ডাক্তারি করে এবং তার পশার ভালোই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বদ্ধ জলাশয় যে পুরুষানুক্রমে সার্বিক পচনের আবহ তৈরি করেছে, তা শশাঙ্ক কথক-স্বর হয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে :

> আমার বাবা তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির অর্ধেক উড়িয়ে ছিলেন মদে আর মেয়েমানুষে। তবে শেষের দিকে হাতে পয়সা যখন কমে এল, তখন হঠাৎ তিনি ধর্মে মন দেন এবং দান-ধ্যান করতে শুরু করেন। প্রতি শীতকালে গরীব লোকের মধ্যে বিশ-ত্রিশ খানা কম্বল বিলি করতেন, কাপড় দিতেন — এসব ছেলেবেলায় আমার দেখা। পৈত্রিক সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা তিনি উড়িয়ে দেন এই দান-ধ্যানের বাতিকে। কেবল এই বসতবাড়ি টুকু ঘুচিয়ে দিতে পারেননি শুধু এইজন্যে যে, সেকালে লোকের ধর্ম ছিল, ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন কেউ মর্টগেজ

দাম্পত্য জীবন মানে কি শুধুই 'বিবাহের বাধ্যবাধকতা ও একত্র বাসের অভ্যাস'? ভারতীয় সাহিত্যে তো অজ-ইন্দুমতী, দিলীপ-সুদক্ষিণার দৃষ্টান্তও রয়েছে যা নিঃসন্দেহে নিছক 'এক ধরনের সাংসারিক ভালবাসা বা মায়া'-র চেয়ে অনেক বেশি কিছুর দ্যোতনা, দাম্পত্য সম্পর্কে বয়ে আনে। বিভূতিভূষণ *অথৈ জল*-এ যে 'অবৈধ প্রেম'-এর কাহিনি লিখেছেন, তা অসম্পূর্ণ হওয়াতে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। লেখক শেষ পর্যন্ত কোন্ পরাপাঠের প্রতিষ্ঠা করতেন, এ নিয়ে কল্পনা নিরর্থক। বরং আমরা লক্ষ করতে পারি, উত্তমপুরুষ কথকের জবানিতে উপস্থাপিত এই কাহিনিতে জীবনের সম্পর্কগত টানাপোড়েন কীভাবে কতখানি ব্যক্ত হয়েছে। বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসতাত্ত্বিক মিখায়েল বাখতিন জানিয়েছেন, 'There cannot be a figure without a ground'। তাই যে-সামাজিক জমিতে শশাঙ্ক পরিকল্পিত হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণ কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সামাজিক পশ্চাৎভূমিকে নানাভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সেইসব লক্ষ না করে শুধুমাত্র কুশীলব ও তাদের ঘিরে ঘটে-যাওয়া ঘটনা লক্ষ করলে ঔপন্যাসিকতার ভিত্তি অস্পষ্ট রয়ে যাবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা দরকার। বাখতিন বুঝিয়েছেন, এ জীবনে প্রতিটি সত্তাই পরস্পরের সহযোগী সত্তা এবং উপন্যাসের আধেয় ও আধারে, বিভিন্ন কুশীলবদের আন্তঃসম্পর্কে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষিতে যদি দ্বিবাচনিকতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই উপন্যাস ব্যর্থ। সেইজন্যে পাঠককেও ভেবে দেখতে হয়, *অথৈ জল*-এ দ্বিবাচনিকতা কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র শশাঙ্ক-সুরবালা-পান্নাকে কেন্দ্র করে কী ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং নায়কের জীবনে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুধুমাত্র তার বিবরণ দিলে বিভূতিভূষণের শিল্পসৃষ্টি স্পষ্ট হবে না। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের পক্ষপাতী বিভূতিভূষণ কী দেখাতে চাইছিলেন? আদর্শ থেকে স্খলনের অনিবার্য পরিণাম? পাপ-পুণ্য সম্পর্কে হিন্দু-সমাজে বহু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি কি তিনি অনুসরণ করেছেন?

চার

বিভূতিভূষণ যে গ্রামীণ পরিবেশকে অজস্র অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ দিয়ে স্পষ্ট করেছেন, শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ* বা *বামুনের মেয়ে* উপন্যাসে চিত্রিত গ্রাম থেকে তা কি চরিত্রগতভাবে কিছুমাত্র আলাদা? প্রতিবেদনের সূত্রধার শশাঙ্ক নিজ গ্রামে ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে ডাক্তারি করে এবং তার পশার ভালোই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বদ্ধ জলাশয় যে পুরুষানুক্রমে সার্বিক পচনের আবহ তৈরি করেছে, তা শশাঙ্ক কথক-স্বর হয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে :

> আমার বাবা তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির অর্ধেক উড়িয়ে ছিলেন মদে আর মেয়েমানুষে। তবে শেষের দিকে হাতে পয়সা যখন কমে এল, তখন হঠাৎ তিনি ধর্মে মন দেন এবং দান-ধ্যান করতে শুরু করেন। প্রতি শীতকালে গরীব লোকের মধ্যে বিশ-ত্রিশ খানা কম্বল বিলি করতেন, কাপড় দিতেন — এসব ছেলেবেলায় আমার দেখা। পৈত্রিক সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা তিনি উড়িয়ে দেন এই দান-ধ্যানের বাতিকে। কেবল এই বসতবাড়ি টুকু ঘুচিয়ে দিতে পারেননি শুধু এইজন্যে যে, সেকালে লোকের ধর্ম ছিল, ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন কেউ মর্টগেজ

আসে যেন। স্খলনের বীজতলি তো গ্রামীণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার শশাঙ্কের স্থবিরোধিতার মধ্যেই নিহিত ছিল। গ্রামীণ জীবনে ওই মানুষটি প্রতাপ-কেন্দ্র এবং দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠাতে গর্বিতও। নীতিবাগীশ শশাঙ্কের সঙ্গে সনাতন চক্কত্তির কথায় পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের ধ্বজদণ্ড-বাহক হিসেবে তাকে চিনে নিতে পারি।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কতখানি ক্ষমাহীন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সনাতন চক্কত্তি শশাঙ্কের কাছে রামপ্রসাদ চাটুজ্যের সঙ্গে শান্তির মেলামেশার কথা বলে। কোন ব্যক্তিগত আক্রোশে সমাজপতিকে তাতাতে চায় সনাতন, তা অবশ্য একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় যখন জানতে পারি ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়কারী হিসেবে রামপ্রসাদ সনাতনের অন্যায় অনুরোধ মানতে চায়নি। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে শশাঙ্ককে 'দেবতুল্য মানুষ' বলে সে খোশামোদ করে। এই গ্রামীণ সমাজ নিরন্ধ্র অন্ধকারের একবাচনিক জগৎ বলেই দুর্বলের উপরে অত্যাচার সহজেই হতে পারে। রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিনিধি দারোগা-পুলিশ গ্রামীণ ক্ষমতা-কেন্দ্রেরই সহযোগী। বিভূতিভূষণ নিজে আড়ালে থেকে শশাঙ্কের মধ্যে স্থবির সমাজের অমানবিক রূপটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে সনাতনের মতো লোকেরা সহজেই রক্ষণশীল শশাঙ্ককে তাতিয়ে তুলতে পারে। তাই সে নাতিপ্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতায় বলতে পারে : 'দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না, দেবোও না কখনো' (পৃষ্ঠা ৮)। একইভাবে স্ত্রী সুরবালাকেও বলে : 'দুর্নীতি গোড়া থেকেই চেপে মারতে হয় — নইলে বেড়ে যায়। সেবার হরিশ সরকারের বৌটাকে কেমন করে শাসন করে দিয়েছিলুম জানো তো? যার জন্যে দেশ ছাড়া হয়ে চলে গেল।' (তদেব) একথায় শশাঙ্কের আত্মপ্রসাদ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। এও এক ধরনের মর্ষকামী পিতৃতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা। প্রাচীন পর্যায়ের সমালোচক হলে লিখতেন, বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে হেসেছেন তখন। সাম্প্রতিককালের বাচনে বলা যায়, এ আসলে শ্লেষগর্ভ নাট্যমুহূর্তের দৃষ্টান্ত। কেননা সমাজের ঘোষিত নীতিরক্ষক নিজেই অল্পদিন পরে ঘোর দুর্নীতির কাজ করবে। বরং দু-একটি লেখার আঁচড়ে শান্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুরবালার বিশ্বাস্য কল্যাণী রূপ ফুটে উঠেছে যার জন্যে পাঠক সমবেদনা পরায়ণ হয়ে ওঠেন।

পাঁচ

বস্তুত এই পর্যায়ে উপন্যাসের বয়ানে সম্পৃক্ত হয়েছে প্রচ্ছন্ন প্রহসনের সুর। গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির সভ্যদের যখন শান্তি সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়, কথক-স্বর অকুণ্ঠভাবে জানিয়ে দেয় :

> পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমি জানি। এ সমিতির আমিই সব, আমার কথার উপর কেউ কথা বলার লোক নেই এই গাঁয়ে। আমিই সমিতির সেক্রেটারী, আমিই সভাপতি — আমিই সব।
>
> (পৃষ্ঠা ৯)

সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে দারোগাকে দিয়ে রামপ্রসাদকে ভয় দেখানো হবে। বাড়িতে ফেরার

পথে লালমোহন চক্রবর্তীর বিধবা মেয়ে শান্তি যখন শশাঙ্কের কাছে কান্নাকাটি করে, উত্তমপুরুষ কথকের প্রতিক্রিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্রূর মনোভঙ্গি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে :

> লালমোহন কাকার মেয়ে গাঁয়ে বসে এমন উচ্ছন্ন যাচ্চে। এ যতই এখন মায়াকান্না কাঁদুক — আসলে এ মেয়ে ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী। ওর কান্না মিথ্যে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।
>
> (পৃষ্ঠা ১০)

ঠিক তখনই যেন লেখক বিভূতিভূষণ হস্তক্ষেপ করেন শান্তির বাস্তব প্রেক্ষিত পাঠককে জানিয়ে দিয়ে। পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে তেরো বছরের শান্তির বিয়ে হয়েছিল। দু-বছর যেতে না যেতে সিঁথির সিঁদুর মুছে গরিব মায়ের চালাঘরে ফিরে এল সে। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবন কাটছিল তার। যৌবনের নিয়মেই রামপ্রসাদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্ক অবশ্য নিরন্ধ্র অন্ধকারের বিধি অনুযায়ীই ঘটেছে। রামপ্রসাদ চাটুজ্যে মদ্যপান করে, নাবালক বৈমাত্রেয় ভাইদের ন্যায্য সম্পত্তির উপস্বত্ব ফাঁকি দিয়ে একা ভোগ করে। সে নিজে বিপত্নীক এবং তার দু-তিনটে মেয়েও আছে। যে-সমাজে মেয়েদের সম্ভ্রম ও নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই অথচ তারা কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানে কোনো কিছুই সহজ পথে হয় না।

তাই সর্বসমক্ষে অপমানিত হওয়ার পরে একদিকে লজ্জা ও ভয় থেকে বাঁচার জন্যে এবং অন্যদিকে শান্তির মতো তরুণীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে রামপ্রসাদ তাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এ ব্যাপারে কথক শশাঙ্কের ভূমিকা রীতিমতো হিংস্র শিকারির মতো যেমন দেখেছি শরৎচন্দ্রের অজস্র উপন্যাসে। মানবচরিত্র সে ভালোই বোঝে; তাই রামপ্রসাদের মতো লোক যে দারোগা পুলিশকে ভয় করে এটা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। আগাগোড়াই বজায় থাকে সমাজের নীতিরক্ষক হিসেবে তার আত্মম্ভরী ঘোষণা :

> ওকে ভাল করে শিক্ষা না দিয়ে আজ ছাড়ছি নে। এ ধরনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারিনে গাঁয়ে।
>
> (পৃষ্ঠা ১৩)

স্ত্রী সুরবালার কোনো কথাকেই সে গুরুত্ব দেয় না পুরুষ-সুলভ অহংকারে :

> কি জানো, তুমি মেয়েমানুষের মত বলছো। আমি এখন এ গাঁয়ে পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী, পাঁচজনে মানে চেনে। এ আমি না দেখলে কে দেখবে বলো। গ্রামের নীতির জন্যে আমি দায়ী নিশ্চয়ই।
>
> (পৃষ্ঠা ১৪)

এসব কথার আড়ালে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে নিদারুণ শ্লেষ। স্বয়ং লেখক বিভূতিভূষণ অন্তরালে-থাকা মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন :

> সুরবালা যা-ই বলুক, সে মেয়েমানুষ বোঝেই বা কি — আমি কিন্তু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম সে রাত্রে। আমি থাকতে এ গ্রামে ওসব ঘটতে দেবো না। একটা পুরুষমানুষ ভুলিয়ে

একটা সরলা মেয়ের সর্বনাশ করবে, এ আমি কখনই হোতে দিতে পারি নে।

(পৃষ্ঠা ১৫)

'সুরবালা মেয়েমানুষ' : পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূই কেবল এই উচ্চারণ করতে পারে। পুরুষের লিঙ্গবাদী চোখে সুরবালারা চিরদিনই আগে মেয়ে, পরে মানুষ। 'গৃহদীপ্তি' নারী তো আসলে গৃহবন্দিনী; তাই যুগ-যুগ ধরে শশাঙ্কেরা এভাবেই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় : 'আমি'-র উদ্ধত আস্ফালন। 'আমি থাকতে এ গ্রামে ওসব ঘটতে দেবো না।' এই 'আমি'-র যখন স্খলন হয়, বহ্নিতে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দেয় — পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের অহংকার কিন্তু পতন রোধ করতে ব্যর্থ হয়। কাহিনি যদিও প্রথম অংশে শ্লথগতি, শান্তির বিপ্রতীপে উপস্থাপিত পান্না প্রতিবেদনে দেখা দেওয়ার পরে ঘটনাবলী দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্রোতহীন এঁদো ডোবাতেই ঔপন্যাসিকতার প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ী ও সংবেদনশীল স্ত্রী সুরবালা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিধি অনুযায়ী সংযোগশূন্য হয়েই থাকে। স্বামী ডাক্তারি করা ছাড়াও সব কাজের মধ্যে মোড়লি করে বেড়ায়, এ তার পছন্দ নয়। কেননা নিষ্ঠুর শাসনে উৎপীড়িতদের 'শাপমন্যি কুড়িয়ে কি লাভ'? পিতৃতান্ত্রিক কথক-স্বরের কাছে তাচ্ছিল্যসূচক 'সদুপদেশ বর্ষণ' যে তার মনে কোনো দাগ কাটে না, এ তো স্বাভাবিকই। চিরকালই বাঙালির পারিবারিক বৃত্তে এই হল সাধারণ নিয়ম। তাই কখন পুরুষের কর্তৃত্ববাচক উপস্থিতিতে ভণ্ডামি ও স্ববিরোধিতার পূর্বাভাস রচিত হয়, পাঠক তা বুঝতে পারেন না। তা স্পষ্ট হয় কেবল কাহিনির উত্তরভাগে যখন শশাঙ্ক স্ত্রীর কাছে ক্ষমতার আস্ফালন দেখায় ('যার চরিত্র নেই সে আবার মানুষ' (পৃষ্ঠা ১৫) কিংবা 'যে দুশ্চরিত্র, তাকে কখনো এ গাঁয়ে আমি শান্তিতে থাকতে দেবো না' (পৃষ্ঠা ১৬)।

এই উদ্ধত উচ্চারণ যেহেতু কাহিনির মধ্যে নিজেকে নিজেই পরাভূত করে, ঘরে এবং বাইরে মেয়েদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য লেখক এবং কথকস্বরের দ্বৈততায় ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায় :

> ওসব কথায় কান দিতে গেলে পুরুষমানুষের চলে না। মনে মনে শান্তির ওপর খুব রাগ হোল। আমার বাড়ীতে আসবার কোন অধিকার নেই তার। এবার ঢুকলে তাকে অপমান হতে হবে।
>
> (পৃষ্ঠা ১৬)

আগেই লিখেছি, ডাক্তার শশাঙ্ক উত্তমপুরুষের বাচনে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যদিও, ব্যক্তি হিসেবে তার পরিচয়ের ভিত্তি প্রথম পর্বেই গঠিত হয়েছে। বাইরে যতই কঠোর ভাব দেখাক, সে ক্ষমতা-মাতাল এবং তোষামোদ তাকে দ্রুত প্রভাবিত করে। মুখে যদিও বলে : 'আমায় কেউ খোশামোদ করুক — এ আমি চাইনে', সমাজের প্রতি তার কর্তব্যের অজুহাতে সে পিতৃতন্ত্রের সন্ত্রাস কায়েম রাখে। রামপ্রসাদের প্রতি সাময়িক শত্রুতা বশত তাকে জব্দ করে সনাতন যেহেতু খুশি, সে শশাঙ্ককে তোল্লা দেয় :

> পুরুষমানুষের মত পুরুষমানুষ বটে তুমি! সমাজে চাই এমন করে এমনি বাঘের মত মানুষ, নইলে সমাজ শাসন হবে কি করে?

এতে উত্তম পুরুষ কথকের প্রতিক্রিয়ায় তার সবচেয়ে বড়ো চারিত্রিক ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে:

সনাতনদার কথাগুলো আমার ভালই লাগলো। সনাতনদাকে লোকে দোষ দেয় বটে, কিন্তু ও খাঁটি কথা বলে। বেঁটে খাটো লোক, অপ্রিয় কথাও বলতে অনেক সময় ওর বাধে না। অমন লোক আমি পছন্দ করি।

(তদেব)

আগেই লিখেছি, এই পর্বে নিরন্ধ্র অন্ধকারের স্থবির জগৎ ঘটনার গতিকে স্তিমিত করে রেখেছে। অথচ ঔপন্যাসিকতার আশ্রয় সেখানেই। এর পরে মাটি ছেড়ে আকাশে ডানা মেলে দিল কাহিনি। পান্নার সঙ্গে শশাঙ্কের সাক্ষাতের পরে বড়ো বেশি দ্রুতগতিতে, উপন্যাসায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই, উপন্যাস সম্পূর্ণ অন্য জগতে পাড়ি দিল। কোনো ভাবেই তা বিভূতিভূষণের স্বক্ষেত্র নয়। পাঠকের এই সন্দেহ হয় যে এত বেশি অতিনাটকীয়তায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ সম্ভবত অন্যত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো ছায়াছবির রঙিন বাস্তবাতীত জগৎ কি হাতছানি দিচ্ছিল বিভূতিভূষণকেও? মঙ্গলগঞ্জের বাজারে ডাক্তারখানার শাখা খোলার মাস দুয়েক পরে কাহিনিতে নতুন পর্বের সূচনা হল। বিভূতিভূষণ অবশ্য পর্বসন্ধিতে কিছুক্ষণ চেনা পথ ধরেই চলেছেন। যেমন নৌকোয় যেতে যেতে কথক শশাঙ্ক দেখে :

ছইয়ের বাইরে বসে দেখি বাঁকে বাঁকে পাড়-ভাঙা ডুমুর গাছ কিংবা বাঁশঝাড়ের নিচে বড় বড় শোল মাছ ঘোলা জলে মুখ উঁচু করে খাবি খাওয়ার মত ভাসছে, কোথাও ভুস্ করে ডুব দিলে মস্ত বড় কচ্ছপটা।

(পৃষ্ঠা ২০)

কিংবা :

একা থাকলে বসে বসে দেখি, উঁচু পাড়ের গায়ে গাঙশালিকের গর্ত, খড়ের বনের পাশে রাঙা টুকটুকে মাকাল ফল লতা থেকে দুলছে, লোকে পটলের ক্ষেত নিড়ুচ্চে।

(পৃষ্ঠা ২২)

আর, যেন বা শশাঙ্ককে তার স্বাভাবিক প্রেক্ষিত থেকে উপড়ে নেওয়ার আগে বিভূতিভূষণ জানিয়ে দেন, তার কোনো কিছুর অভাব ছিল না। বাবা শিবচরণ যত জায়গা জমি রেখে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে নিজে আরও যোগ করেছে এবং সব মিলিয়ে তার আয় ভালোই। বৈষয়িক সমৃদ্ধি নিয়ে সে যে পরিতৃপ্ত, তা কথকস্বর অস্পষ্ট রাখেননি :

অন্তত ষাট-সত্তর ঘর প্রজা আছে আশেপাশের গাঁয়ে। আম-কাঁঠালের বড় বড় দুটো বাগান, তিনটে ছোট বড় পুকুর, পঁয়ত্রিশ বিঘে ধানের জমিতে যা ধান হয় তাতে বছরের চাল কিনতে হয় না। সুরবালার মত স্ত্রী। পাড়াগাঁয়ে অত বড় বাড়ী হঠাৎ দেখা যায় না। অন্তত আমাদের এ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে বেশী নেই। নিজে ভাল ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে ভাল ছেলেই ছিলাম।

এইবার পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। যার কোথাও কোনো অভাব নেই, কোন অলীক অভাব-বোধে সে কিশোরী পান্নার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সম্পন্ন গার্হস্থ্য, জীবিকার সাফল্য, সামাজিক প্রতিপত্তি ছেঁড়া কাঁথার মতো পেছনে ফেলে আসে? ঘোষিত নীতিবাগীশ মানুষটি কীভাবেই বা সামাজিক শ্রেয়োনীতি বিস্মৃত হয়? অস্তিত্বের কোন গোপন কোণে লুকিয়ে-থাকা হিংস্র অন্ধকার তাকে আলেয়ার দিকে প্ররোচিত করে? এর কোনো সদুত্তর যে কাহিনির মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, এর সম্ভাব্য জবাব কি রয়েছে ছায়াছবির মোহময় জগৎ থেকে ভেসে-আসা নক্ষত্র-সংকেতে? নাকি জীবনানন্দের মতো লিখব : 'অথবা দেখিল সে কোন্ ভূত?' কিন্তু শশাঙ্কের তো কোনো অস্তিত্ব-সংকট কোথাও ছিল না যে তার অনুভবে জাগবে : 'জানি তবু জানি/নারীর হৃদয় প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি/অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয় —/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে;/আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত — ক্লান্ত করে।'

জীবনানন্দীয় এই অবসাদ ও ক্লান্তি তো বিভূতিভূষণের কখনো ছিল না। শশাঙ্ক আত্মতৃপ্ত সুখী গৃহস্থ; যে-ক্লান্তির বশে সে পান্নার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অস্তিত্বের গোপন প্রণোদনায় ওই সম্পর্ক হয়ে উঠতে পারে 'লাশ-কাটা ঘর' — তা তো ছিল না তার কখনো। তাহলে কি অন্য কোথাও এর মীমাংসা নিহিত আছে! এই নিবন্ধের শুরুতে যে 'evil'এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি, সেই নিগূঢ় অমঙ্গল কি একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করছিল পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের একদেশদর্শী নারী-নিগ্রহে! গ্রামোন্নয়ন যতই শশাঙ্কের বাতিক হোক, পল্লীমঙ্গল সমিতি গড়ে উঠুক, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিক — নারীসত্তার নিরাকরণে হিংস্র শিকারির ভূমিকা এবং কখনো কখনো হরিদাস ঘোষের স্ত্রীর মতো কয়েকজনের আত্মহত্যার নিমিত্ত-কারণ হয়ে ওঠাও তার বিবেক-দংশনের সূচনা করেনি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসী বিভূতিভূষণ কি অবচেতনে পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের বোধ লালন করছিলেন? কাহিনিতে তা যতই অপ্রকাশ্য হোক, প্রাগুক্ত 'evil'কে শশাঙ্ক নিজেই ডেকে এনেছে। আর, তখনই শুরু হয়েছে তার স্খলন এবং এই স্খলনের মধ্যেই ছিল তার আত্ম-নিরাকরণমূলক প্রায়শ্চিত্তও। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সাম্প্রতিককালের প্রসিদ্ধ দার্শনিক-সমালোচক জাঁ বদ্রিলারের এই অসামান্য দ্যোতনাময় মন্তব্য :

> It is not the figure of seduction that is mysterious, but that of the subject tormented by his own desire or his own image.
>
> (*Cool Memories* : 2003 : 5)

এই 'seduction' উপন্যাসে কে কাকে করেছে, তা বলা মুশকিল। পান্না করেছে শশাঙ্ককে; তেমনি আত্ম-সম্মোহনের ব্যবস্থা শশাঙ্ক নিজেই করেছে যেন। তাই খেমটা নাচের আসরে যাওয়ার সময় যে-মানুষটি একটা কদম গাছে থোকাথোকা কদম ফুল ফুটতে দেখে, সে নাচের আসরে কী ভাবে আব্দুল হামিদ বা গোবিন্দ দাঁ, বা প্রহ্লাদ সাধুখাঁর মতো নারীমাংস-লোলুপ নীচজনদের সঙ্গে কার্যত একই পঙ্‌ক্তিতে অবস্থান নেয়!

আসলে এ ছিল কাহিনিতে পর্বসন্ধি পেরিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক ইশারা। পাড়াগাঁ অঞ্চলে

উন্নাসিক আভিজাত্যের গর্বে যেসব পয়সাওয়ালা লোক নিজেদের কেষ্টবিষ্টু ভাবে এবং স্থূলতার প্রতিমূর্তি হয়ে নারী-সম্ভোগের ফন্দিফিকির খোঁজে, শশাঙ্ক প্রথমদিকে তাদের পর্যায়ে নেমে যায়নি। কিন্তু অচিরেই তার মনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ব্যবহারও গেছে আমূল বদলে। কিন্তু উপন্যাসে তো এত আকস্মিক পরিবর্তনের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। সম্মোহনের এই পর্বটি তবে কি উপন্যাসের এলাকা ছেড়ে চিত্রনাট্যের ধরন আত্তীকরণ করতে চেয়েছে! কাহিনির কথক শশাঙ্ক যখন অল্পবয়সি মেয়েটিকে বিভোর হয়ে দেখছিল, সে তখন আর পাঠকের চেনা নীতিবাগীশ সমাজপতি নয়, দক্ষ চিকিৎসক নয়, দায়িত্ববান গৃহস্থও নয়। নারীদেহের সৌন্দর্য সহ তার কিন্নর কণ্ঠ শশাঙ্ককে সম্পূর্ণ সম্মোহিত করে ফেলেছিল। তবে মোহগ্রস্ত অবস্থাতেও কথক যেন লেখকের কাছ থেকে পাওয়া সূত্রধারের দায়িত্ব ভোলেনি :

> ওর অঙ্গুলির স্পর্শে আমার অতি সাধারণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন জীবন ভূমার আনন্দ আস্বাদ করল। অতি সাধারণ আমি অতি অসাধারণ হয়ে উঠলাম। আরও কি কি হোল, সেসব বুঝিয়ে বলবার সাধ্য নেই আমার। আমি গ্রাম্য ডাক্তার মানুষ, এ গ্রামে ও গ্রামে রোগী দেখে বেড়াই, সনাতনদা'র সঙ্গে গ্রাম্য-দলাদলির গল্প করি; একে ওকে সামাজিক শাসন করি, আর এই প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, নেপাল প্রামাণিক, ভূষণ দাঁয়ের মত লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াই। আমি হঠাৎ এ কি পেয়ে গেলাম? কোন্ অমৃতের সন্ধান পেলাম আজ এই খেমটা নাচের আসরে এসে? আমার মাথা সত্যিই ঘুরচে। উগ্র মদের নেশার মত নেশা লেগেচে যেন হঠাৎ। কি সে নেশার ঘোর, জীবনভোর এর মধ্যে ডুবে থাকলেও কখনো অনুশোচনা আসবে না আমার।
>
> (পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯)

এই উচ্চারণে যে-আবেগ ব্যক্ত হল, তার পেছনে কোনো সত্য নেই, আছে সেই আগ্রাসী মোহ, যা লিবিডোর সর্বাত্মক উপস্থিতি থেকে উৎসারিত। কথকস্বর আর যা-ই করুক, আত্মবিশ্লেষণ করেনি। উপন্যাসের মতো শিল্পমাধ্যমে সম্ভব ও অসম্ভবের বিচার খুব সূক্ষ্ম। সম্ভাব্য অসম্ভব অর্থাৎ যে-অসম্ভব ঘটনা শিল্পিত উপস্থাপনায় সম্ভবপর এবং অসম্ভব সম্ভাব্যতা অর্থাৎ যা হলেও হতে পারে অথচ শিল্পে তা অসম্ভব : এই দুয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য ও তাৎপর্য আগে বুঝে নিতে হয়। শশাঙ্কের এই অনুশোচনাহীন মাদকতা যেহেতু প্রতিবেদনে কোথাও কোনো পূর্বাভাস দেয়নি, এই মনোভঙ্গিকে আকস্মিকভাবে আরোপিত না ভাবলে সত্তার সংহতি সম্পর্কেই বিশ্বাস ধ্বস্ত হয়ে যায়। ধরে নিতে হয় যে পিতৃতন্ত্র শাসিত সম্ভোগ-প্রবণ পুরুষ অবধারিত সর্বগ্রাসী উপস্থিতি নিয়ে নারীসত্তাকে গ্রাস করবে অথবা নারীর পিতৃতন্ত্র নির্মিত মোহিনী মূর্তি রম্ভা-তিলোত্তমা-মেনকা-উর্বশীর উত্তরসূরি হয়ে যে-কোনো পুরুষকে শিকড়চ্যুত করবে। এই উপলব্ধি যদি অনতিক্রম্য হয়ে পড়ে, তবে কেন উপন্যাস কেনই বা শিল্পসৃষ্টি। মুজরো করতে এসে ষোড়শী পান্না কেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি বিবাহিত ডাক্তারের প্রেমে পড়ে যায়, তার কোনো ব্যাখ্যা পাঠকৃতিতে নেই। যেন দুর্নিবার নিয়তি মোহগ্রস্ত করে সূত্রধার কথকসত্তাকে। অতিদ্রুত আকাশকুসুম কল্পনায় ভেসে যায় সে; তার বংশগৌরব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অবান্তর হয়ে পড়ে পান্নাকে পাওয়ার জন্যে। সে

ছল-চাতুরি শুরু করে সুরবালা সহ সবার সঙ্গে। রোগীর প্রতি দায়িত্বও ভুলে যায়। সার্বিক স্খলনের এই ছবিতেই 'evil' আপন উপস্থিতি ঘোষণা করেছে। ধাপে ধাপে অথৈ জলের অতলে নেমে যায় ডাক্তার শশাঙ্ক।

সাত

একবার বিভূতিভূষণ আত্মপ্রকাশ করেছেন কথক-স্বরের আড়াল থেকে : 'নাগিনী কুহক দৃষ্টিতে আকর্ষণ করচে তার শিকারকে।' (পৃষ্ঠা ৬০) এ তো অভ্যস্ত পিতৃতান্ত্রিক বয়ান কেননা পান্না যদি নাগিনী হয় শশাঙ্কও কি অতি আগ্রহে নাগপাশে জড়িয়ে যেতে তৈরি হয়নি। অতএব যা অবধারিত, তা-ই হল। কলকাতার নেবুতলায় ক্ষুদ্র গলির মধ্যে বাসা নিল শশাঙ্ক। এই পর্যায়ে পান্না যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা বিভূতিভূষণের চেনা জগতের ছক অনুযায়ী। এমন নয় যে পান্না সমাজ-ব্যবস্থার বাইরে বলেই তাকে একটিমাত্র রঙে আঁকতে হবে। কিন্তু যা পুরোপুরি লেখকের অভিজ্ঞতার বাইরে, কল্পনা দিয়ে তা পূরণ করা যায় না। তাই গৃহবধূর আকল্পই পান্নার আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠেছে। বারকয়েক খেমটা নাচের বিবরণ বা ছকমতো বাড়িউলির উপস্থাপনা দিয়েও সব ঘাটতি সামাল দেওয়া যায়নি। সুরবালা ও পান্নার বারংবার প্রতিতুলনা করেও নয়। কথকস্বর যে 'বুভুক্ষিত হৃদয়ের আকুতি'-র কথা জানিয়েছে, তা বয়ানের মধ্যে সমর্থিত নয়। অন্যদিকে পান্নার মতো লাবণ্যময়ী কিশোরী (এবং পুরুষ-সাহচর্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ) কেন অসমবয়সি গ্রামীণ ডাক্তারের প্রেমে নিমজ্জিত হল, তাও বোঝা গেল না। বিভূতিভূষণ কখনো লিখেছেন তার বয়স ষোলো কখনো বা সতেরো-আঠারো। সম্ভবত এই কাহিনি রচনায় তাঁর মনোযোগের অভাব ছিল; তাই কখন যে বয়ানের ভরকেন্দ্র বিচলিত হয়ে পড়েছে, তা তিনি লক্ষ করেননি। এমন নয় যে 'কিশোরীর প্রেম নিকষিত হেম/কামগন্ধ নাহি তায়' এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নীতিবোধ থেকে বিভূতিভূষণ শশাঙ্ক ও পান্নার শরীরী সংবাদের বর্ণনা করেননি; বস্তুত স্পষ্টতই টের পাওয়া যায়, অদৃশ্য হাত তাঁর কলম চেপে ধরেছে। ন্যায়-অন্যায়ের দোলাচল যে কথক-চরিত্রে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু বড়ো দ্রুত সে 'কুহকজালে' জড়িয়ে গেছে। উচিত-অনুচিতের বোধও লুপ্ত হয়ে গেছে।

নিজের সপক্ষে কোনো যুক্তি শশাঙ্ক দেখায়নি; ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সংস্কার অনুযায়ী এইমাত্র ভেবেছে। 'নিয়তির ফল বোধহয় খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। ... জীবনের জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার।' (পৃষ্ঠা ৬২) এতে হয়তো অনেকখানি আত্মগ্লানিও মিশেছিল; কিন্তু মোহজাল খণ্ডন করার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। তাই তো বাড়িতে ফিরে না গিয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শশাঙ্ক ভেসে গেছে কালস্রোতে। পান্নার সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে কলকাতায়। তখন কি প্রাগুক্ত 'evil' নরকের তোরণে খচিত লিখন সম্পর্কে আমাদের নিঃশব্দে অবহিত করে তোলে : 'Abandon all hope, ye who enter here।' সেই মুহূর্তেও শশাঙ্কের আত্মপ্রতারণা অবাধ, অগাধ :

> আমি জানি, পান্না খুব বদমাইশ মেয়ে, আমি ওকে দেবী বলে ভুল করি নি মোটেই। দেবী হয় সুরবালাদের দল। দেবীদের প্রতি আমার কোন মোহ নেই বর্তমানে। দেবীরা এমন চোখ নাচাতে পারে? এমন বদমাইশির হাসি হাসতে পারে? এমন ভালমানুষকে টেনে নিয়ে

ঘরের বার করতে পারে? এমন পাগল করে দিতে পারে রূপে ও লাবণ্যের লাস্যলীলায়? দেবীদের দোষ, মানুষকে এরা আকৃষ্ট করতে পারে না। শুধু দেবী নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমার গোটা প্রথম যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েচে দেবীদের সংসর্গে। দূর থেকে ওদের নমস্কার করি।

(পৃষ্ঠা ৬৪)

চমৎকার। এই না হলে পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি। তার বাচনে সেই চিরবর্তমান পিতৃতান্ত্রিক নির্মিতি : নারীকে 'দেবী' অভিধা দিয়ে প্রতিমায়িত করো নয়তো উর্বশী কলাবতীর মতো সম্ভোগের জন্যে রমণীয়, করে তোলো। তার প্রথম যৌবন সামাজিক প্রথার আনুগত্য করে 'নষ্ট' হয়ে গেছে — এই চিন্তায় প্রভূত অকৃতজ্ঞতাও মিশে আছে। আবার শশাঙ্ক ও পান্নার সম্পর্ক বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়েছে, এমনও নয়। খুঁটিয়ে পড়লেই তা বোঝা যায়। বাড়িউলি মাসির কথাতেই স্পষ্ট, বাইরে মুজরো করতে গেলেই পান্না সঙ্গে বাবু নিয়ে ফেরে এবং কিছুদিন একসঙ্গে থাকে। এতসব শুনেও যে মার্জিতরুচি ও আভিজাত্য-সচেতন শশাঙ্কের মোহ কাটল না, তা খুব স্বাভাবিক নয়। অবশ্য মাঝে-মাঝেই কথকস্বরে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সত্যের ভিন্ন মাত্রা; তবে জ্ঞানপাপীর জন্যে কোনো মোহমুদ্গর নেই :

সুরবালা সুরবালা, পান্না পান্না — এ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বাক্যবিন্যাস করে কোন লাভ নেই। ... প্রতিমার মাটির তৈরী পা ও আমাকে দেখতে দিলে না।

(পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯)

কিন্তু এরপর স্বক্ষেত্র ছেড়ে বিভূতিভূষণ যত অপরিচিত জগতে পাড়ি দিলেন, চেনা বাস্তবের পিছুটান কাহিনিকে কোথাও পৌঁছাতে দিল না। বিশেষত পান্নাকে তিনি কীভাবে আঁকবেন এবং কী তাঁর অন্বিষ্ট, তা পুরোপুরি অনিশ্চিত রয়ে গেল। কয়েকমাস ধরে কথক-সূত্রধার যে পসারওয়ালা ডাক্তার হয়েও খেমটাওয়ালীর সারেঙ্গী বয়ে বেড়াল অথচ তার মনে কোনো কষ্ট বা খেদ হল না — তা বড়ো বেশি সরলীকৃত। অসম-বয়সি প্রেমিকের নিঃস্বতার বার্তা পান্না যে সহজভাবে গ্রহণ করে এবং মুজরোর টাকায় ওদের সংসার চলে — এই বিবরণেও কি খুব স্বাভাবিকতা আছে? বেথুয়াডহরি গ্রামে নায়েবমশাই (বঙ্কুবিহারী জোয়ারদার) লালসার যে-উগ্রতা দেখায়, তার পরে কথকের সঙ্গে ব্যবহারে যত উচ্চাবচতা দেখা যায়, তাও কি বাস্তব-সম্মত? যে-মানুষটি দিনে তিনবার ধুতি-পাঞ্জাবি বদলাত; সে ছেঁড়া জুতো পরে আর মলিন জামা গায়ে দিয়ে দু-এক টাকার বাজার করে — এ কি বিভূতিভূষণের নিজস্ব ধরনে 'evil' সংক্রমণের প্রায়শ্চিত্ত? অথবা সচেতন স্রষ্টা-মন ও অবচেতন অভিপ্রায়ের দ্বন্দ্ব ব্যক্ত হয়েছে কথক-স্বরের নিম্নোধৃত বয়ানে :

যেন ভাঙ খাওয়ার নেশার মত রঙীন নেশাতে মশগুল হয়ে বসে আছি। ...
সুরবালার সঙ্গে এতদিনের ঘরকন্না আমার ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে।
ভালবাসা কি জিনিস, ও আমাকে শেখায় নি।
যদি কখনো না জানতাম এ জিনিস, জীবনের একটা মস্ত বড় রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতাম।

সুরবালার চিন্তা আমাকে কখনো নেশা লাগায়নি।

কিন্তু কেন? সুরবালা সুন্দরী ছিল না, তা নয়। আমাদের গ্রামের বৌদের মধ্যে এখনো সুন্দরী বলে সে গণ্য। এখন তার বয়েস পান্নার ডবল হতে পারে, কিন্তু একসময়ে সেও ষোড়শী কিশোরী ছিল। কিন্নরকণ্ঠী না হোলেও সুরবালার গলার সুর মিষ্টি। এখনো মিষ্টি। ষোড়শী সুরবালাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু কিসের অভাব ছিল তার মধ্যে? অভাব কিসের ছিল তখন তা বুঝি নি। এখন বুঝতে পারি, পান্নার ভালবাসা পেয়ে আমার এই যে নেশার মত আনন্দ, এই আনন্দ সে দিতে পারে নি। নেশা ছিল না ওর প্রেমে।

(পৃষ্ঠা ১০৫)

এ তো সেই চিরাচরিত আত্মপ্রতারক পিতৃতান্ত্রিক যুক্তিশৃঙ্খলা। সুতরাং লেখকের অবচেতন অভিপ্রায়ে যদি প্রায়শ্চিত্ত থেকেও থাকে, এখানে তার দূরবর্তী পূর্বাভাস কল্পনা করা যেতে পারে মাত্র। মুজরোওয়ালীর কন্যা পান্না যখন উপার্জনের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় যায়, শশাঙ্ক নানা ধরনের লম্পটদের সঙ্গে পরিচিত হয়। কেশবডাঙায় যেমন ঝড়ু মল্লিক নামে পল্লিকবি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য পান্নার শরীরে আঁচও পড়ে না। মনে হয় যেন বিভূতিভূষণ খুব সতর্কভাবে, মধ্যবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পান্নার শরীরী শুচিতা রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই তারাশঙ্করের বসন-এর তুলনায় সে ভিন্ন গোত্রের। অবশ্য ঝড়ু মল্লিক অনেকটা বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শশাঙ্ক ও পান্নার সম্পর্কের মধ্যে ভাবের খাতিরে সর্বস্ব ত্যাগ খুঁজে পায় যা অনেকটা আধ্যাত্মিকতার কাছাকাছি। তাহলে কি বিভূতিভূষণ আপন অন্তর-ধর্মের প্রবণতা অনুযায়ী এর একটা ভাববাদী ব্যাখ্যা খুঁজতে চাইছিলেন? তবে ঝড়ুর কাছে প্রেমিক শশাঙ্ক যত 'খাঁটি মানুষ' হোক না কেন, কাহিনির মূল আকল্পকে তা ছায়াচ্ছন্ন করতে পারে না। গল্পের মধ্যে গল্প হিসেবে পাঠকের অতিরিক্ত প্রাপ্তি হয় ঝড়ুর প্রেমকথা।

উপন্যাসের অসম্পূর্ণ বয়ান যখন খণ্ডিত মোহনার দিকে যাত্রা করে, হঠাৎই শশাঙ্ক ও পান্নার একত্রবাস শেষ হয়ে যায়। এর ঠিক আগে পান্না সম্পর্কে কথকের এই উপলব্ধি হয় :

ও দেখচি খাঁটি আর্টিস্ট মানুষ। ... পান্না সেই ধরনের মেয়ে, যে ভাবের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সংসারের ধার ধারে না, বেশী খোঁজখবরও না।

(পৃষ্ঠা ১১৯)

উলটোদিকে নিজেকে খাঁটি বাস্তববাদী ভাবে বলেই হয়তো কথক হঠাৎ হঠাৎ পান্নাকে ছাড়ার কথাও ভেবে নেয়। অবশ্য অতিনাটকীয়ভাবে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যায় যখন পান্নার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এসে নাবালিকা পান্নাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে চলে যায়। প্রেমিককে হয়রানি থেকে বাঁচানোর জন্যে পান্না যে স্বেচ্ছায় পুলিশের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যায়, এই বিষয়টিকে যেন বা স্বভাবধর্ম অনুযায়ী ভুল বুঝেছে কথক। অন্তিম কয়েকটি পৃষ্ঠায় আমরা লক্ষ করি নিঃস্ব রিক্ত প্রেমিকের প্রতিকারহীন অভিমান। একা ঘরে শুয়ে তার বুকভাঙা কান্না আসে। সে লক্ষ করে পান্না যাওয়ার সময় একটি টাকাও নিয়ে যায়নি। এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় লালবাজারের কাছে সনাতনের সঙ্গে কথকের দেখা হয়ে যায়। অসম্পূর্ণ কাহিনির মধ্যে উপসংহার খুঁজে লাভ নেই। পাঠক শুধু

লক্ষ করেন, লেখক-কথকের যুগলবন্দিতে এই বিচ্ছেদের মধ্যে পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা :

> দিন রাত, চন্দ্র সূর্য, সকাল বিকেল, ইহকাল-পরকাল, ভালমন্দ — সব গিয়ে সেই একবিন্দুতে মিশচে — পান্না। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁদের নাকি এমন দশা হয় শুনেচি। ঈশ্বরের বিষয় ছাড়া ভাবতে পারে না, ঈশ্বরের কথা ছাড়া কইতে পারে না।
>
> (পৃষ্ঠা ১২৭)

এই বয়ান কি পাঠককে বিভ্রান্ত করে না? প্রকৃত অর্থেই পাঠক এই বিন্দুতে এসে অথৈ জলে পড়ে যান। লেখকের এলোমেলো সঞ্চরণে বাস্তবের মধ্যেই প্রতিবাস্তবের অনির্দিষ্ট পরিসর রচিত হয় যেন।